ছেলেবেলা

হারিয়েছি নদী, পেয়েছি সড়ক

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

রাজশাহী ছেড়ে যখন কলকাতায় রওনা হয়েছি সেই ১৯৪৬-এর শেষ দিকে তখন পুরোপুরি বুঝিনি ব্যাপারটা, কিছুটা বুঝলাম অনেক পরে, এখন ভালোভাবেই বুঝতে পারছি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে। ব্যাপারটা ছিল এই যে কেবল বাল্যবন্ধুদের ছেড়ে যে চলে যাচ্ছিলাম তা নয়, মস্ত বড় বন্ধু ছিল যে নদী-পদ্মা নদী, তাকেও রেখে যাচ্ছিলাম পেছনে। রাজশাহীর পদ্মার সঙ্গে আবারও দেখা হয়েছে, অনেকবার, কিন্তু সেসব বহু বছর পরের ঘটনা, রাষ্ট্রীয় উত্থানপতনের পর, পদ্মা তত দিনে অতিশয় শীর্ণকায়। রাজশাহী শহর অত্যন্ত তপ্ত থাকত গ্রীষ্মে, পদ্মা তখন বাতাস দিত, বেড়াবার জায়গা দিত, আর যখন বর্ষা আসত ঝমঝমিয়ে পদ্মা তখন একেবারে অন্য রকমের-তার পানি হুমকি দিত, ভাসিয়ে দেবে শহরকে, তখন পানি আটকানোর গেটগুলো সব খুলে দেওয়া হতো তড়িঘড়ি, আঁকাবাঁকা খালগুলোতে স্রোত বইত শিশুদের কোলাহল করা নৃত্যের মতো। একবার ফুটবল খেলতে গিয়ে পা ভেঙেছিলাম, তখন প্লাস্টার করা অবস্থায় এক মাস বিছানাই ছিল আশ্রয়। সেই সময়ে বর্ষা এসেছে, খাল ভরে উঠেছে, আমি ঘরের জানালা দিয়ে দেখেছি, ভাইবোনেরা কাগজ ও কলাগাছের বাকল দিয়ে নৌকা তৈরি করে ভাসিয়ে দিচ্ছে স্রোতে।

কলকাতায় গিয়ে গঙ্গা পাওয়া গেল। কিন্তু সে হচ্ছে খিদিরপুরের গঙ্গা-ডকের, জাহাজের, খালাসিদের। শুনেছি, খিদিরপুরের যে রাস্তায়-ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিটে-আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পিতা অতিদ্রুত বাসা ভাড়া করেছিলেন, সেখানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার বাল্যকালে কিছুদিন ছিলেন: তখন তিনি গঙ্গাকে কীভাবে পেয়েছেন জানি না, কিন্তু মন যে ভরেনি তার, সে তো জেনে গেছি আমরা কপোতাক্ষ নদকে তিনি যেভাবে সজল নয়নে স্মরণ করেছেন, সেই ঘটনার ভেতর দিয়েই।

না, গঙ্গার ধারে আমাদের ভ্রমণ করা হয়নি, পদ্মার ধার দিয়ে যেমনটা করেছি আমরা আমাদের বাল্যকালে। কলকাতায় গিয়ে বিদ্যুৎ, পানি, ট্রামগাড়ি, চিড়িয়াখানা, চৌরঙ্গী, গড়ের মাঠ, সিনেমা হল, নতুন বন্ধু-সবকিছু পেলাম কিন্তু ওই যে নদী, সে গেল হারিয়ে। এমনকি হারিয়ে যে গেছে সেই বোধটুকুও তখন জেগে ছিল না।

কেননা আমরা খুবই ব্যস্ত ছিলাম। ছেচল্লিশে সাধারণ নির্বাচন হয়েছে। সে-নির্বাচনে আমার বাবার দায়িত্ব পড়েছিল বোধ করি নওগাঁর কোনো নির্বাচনকেন্দ্রে। সিলগালা বাক্স, মোমবাতি, পোস্টার এবং অফিসের পিওন একজন, এসব নিয়ে নির্বাচনের কাজ শেষ করে তিনি রাতের গভীর প্রহরে ফিরেছিলেন মনে আছে, আর সে-নির্বাচনে তো মুসলিম লীগের ঘটেছিল জয়জয়কার। সে-বছরই তিনি বদলি হয়ে যান কলকাতায় এবং তারই শক্ত টানে রাজশাহীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ। কলকাতায় গিয়ে নতুন স্কুল, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন অনেক কিছু পাওয়া গেল। রাজশাহী তখন স্তিমিত হয়ে এল। রাজশাহীতে নাটকের চর্চা ছিল: সিরাজউদ্দৌলা তখন অতিশয় জনপ্রিয় নাটক। শহরে হিন্দু-মুসমান দাঙ্গা আমরা দেখিনি, কিন্তু দু'সম্প্রদায়ের ভেতর রাজনৈতিক দূরত্ব তো অবশ্যই তৈরি হচ্ছিল, তার মধ্যেও দেখেছি, খেলার মাঠের প্রান্তে মঞ্চ তৈরি করে নাটকের অভিনয় চলছে এবং তাতে দর্শকদের ভেতর তো অবশ্যই, অভিনেতাদের ভেতরও দু'সম্প্রদায়ের লোকই ছিল, যদিও হিন্দুর সংখ্যাই ছিল বেশি, স্বভাবতই। এখন শুনতে অস্বাভাবিক শোনাবে, তখন, সেই চল্লিশের দশকেও রাজশাহীর ছেলেরাই মেয়ে সেজে মঞ্চে দেখা দিত। সিরাজউদ্দৌলা সেজেছিলেন যিনি তিনি মুসলমান নন, শহরের সাহেববাজারে ভদ্রলোকের একটা ঘড়ির দোকান ছিল, সে-দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাংলার শেষ নবাবকে পুনরায় দেখার জন্য যে উঁকিঝুঁকি দিইনি তাও নয়, একবার মনে হয় দেখেও ফেলেছিলাম, ঘটনাটি যে স্মরণীয় সে তো বোঝাই যাচ্ছে ষাট বছর পরেও সেটা যে ভুলে যাইনি তাতেই।

কলকাতায় তখন সাড়ে তিন বছর ধরে একটানা কিসমৎ ছবি 'চলছে'-ওই ছবি আমরা রাজশাহীতেই দেখে এসেছি। কিসমৎ-এ দেশপ্রেমিক একটা উপাদান ছিল, যেটা তার অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণগুলোর একটি। খিদিরপুরে আমাদের পাড়াতেই ছিল দুটি ছবিঘর-কামাল টকিজ ও ছায়াবাণী-যার দুটিতেই আমরা ছবি দেখেছি। সবই হলো, কিন্তু কলকাতা তো কঠিন শহর। অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে ১৯৪৭-এ। তখন ট্রাম ধর্মঘট চলছে, যেদিন ধর্মঘট ভাঙল সেদিনকার চাঞ্চল্যকর দৃশ্যটা মনে আছে। প্রত্যেকটি ট্রাম গাড়ির সামনে তিনটি পতাকা উড়ছে, একপাশে কংগ্রেসের তিনরঙা, অপর পাশে মুসলিম লীগের সবুজ পতাকা, মাঝখানে লাল পতাকা, কমিউনিস্ট পার্টির। আমার বাবা মনে করতেন, লাল পতাকাওয়ালারাই সাচ্চা স্বাধীনতাকামী। যদিও বাসায় তিনি রাখতেন মুসলিম লীগের নতুন দৈনিক ইত্তেহাদ।

ওই ট্রামেই কলকাতার সঙ্গে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়। আমার বাবা অনেক ব্যাপারেই বেশ ধীরস্থির ছিলেন, বেশ অস্থির হয়ে উঠতেন একটা কাজ পেলে। সেটা হলো সন্তানদের জন্য পাঠ্যবই কেনা। খিদিরপুরে সেন্ট বারনাবাস হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। এই সেদিন শুনলাম ওই স্কুলে নাকি সিপিএম নেতা প্রয়াত অনিল বিশ্বাস একসময়ে শিক্ষকতা করতেন, সে অবশ্য অনেক পরের ঘটনা হবে। বুকলিস্ট বাসায় আনার পর বাবা আর দেরি করেননি, আমাদের দু'ভাইকে বগলদাবা করে নিয়ে রওনা দিয়েছেন কলেজ স্ট্রিটের অভিমুখে। সেখান থেকে ফিরছি, ধর্মতলায় আমাদের নামবার কথা, বাবা ও ছোট ভাই নেমে পড়েছে, কিন্তু আমি হাঁদারাম নামতে পারিনি, তার আগেই ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম সচল হয়ে উঠেছে। আমি পাদানিতে দাঁড়িয়ে, বাবা তার অন্য ছেলেটির হাত ধরে পরবর্তী স্টপেজের দিকে ছুটেছেন, আমিও বিপন্ন বোধ করছি পরের স্টপেজে নামতে পারব কি না, এই উৎকণ্ঠায়। ওই ঘটনা কলকাতার সঙ্গে আমার সরাসরি পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে। এখানে মফস্বলের গতিতে চলাফেরা করা চলবে না, চটপটে হতে হবে।

আমাদের স্কুলটা ছিল খিদিরপুর ও আলীপুরের মাঝখানে, তার এক পাশে হিন্দু বসতি অন্য পাশে মুসলমান আধিপত্য। ট্রাম-শ্রমিকদের ইউনিয়ন যে ঘোষণাই উচ্চে তুলে ধরুক না কেন, ভূমিতে বাস্তবতা ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। আমরা যখন কলকাতায় গেছি তখন গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং থেমে গেছে: কিন্তু তার সমাপ্তি যে নিশ্চিত হয়েছে তা নয়। ছোটখাটো ঘটনা ঘটছিল। মাঝেমধ্যে এলাকাবিশেষ কার্ফ্যু জারি করে দাঙ্গাকারীদের ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র খোঁজার কাজটা চলছিল। আমরা স্কুলে যেতাম দল বেঁধে, পায়ে হেঁটে কিন্তু হিন্দু এলাকার কাছে এলেই স্রোতটি দু'ভাগ হয়ে যেত: মুসলমানপাড়ার কাছেও ওই একই দশা। দু'ভাগ। যেন হিন্দুস্তান-পাকিস্তান, দেশভাগের পরিষ্কার পূর্বলক্ষণ।

ট্রামস্টপেজ থেকে আমাদের বাসাটা খুব যে দূরে ছিল তা বলা যাবে না। কিন্তু এক সন্ধ্যায় ওই রাস্তাটাকে খুবই অনিশ্চিত, উদাসীন এবং প্রায় নিষ্ঠুরই মনে হয়েছিল। সেই দিন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এসে গেছে, কিন্তু আমার বাবা অফিস থেকে ফেরেননি। বাসার সকলেই চিন্তিত। কেউ কিছু বলছে না। আমি দেখছি, পরিবেশটা অসহ্য, তাই গুটি গুটি পায়ে বের হয়ে এসেছি, দাঁড়িয়ে রয়েছি স্টপেজের কাছে। ট্রাম আসে, ট্রাম যায়, লোক ওঠে, লোক নামে: কিন্তু আমার বাবার কোনো খবর নেই। ভেতরে অস্থিরতা বাড়ছে, তাই পায়চারি শুরু করেছিলাম। একবার বাসার দিকে এগোই, আরেকবার ঘুরে ট্রামমুখো। তারপর একসময় দেখি বাবা ট্রাম থেকে নামছেন। আমি ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, কোথায় গেছিলেন। বাবার সেই ক্ষমাপ্রার্থী সলজ্জ হাসিটি ভুলব না। বললেন, ফেরার পথে কলেজ স্ট্রিটে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন, তারা চা না খাইয়ে ছাড়বে না, তাই দেরি হয়ে গেছে। ভুল করেছেন, আগে থেকেই জানিয়ে রাখা উচিত ছিল। দাঙ্গার কলকাতা!

তারপর একদিন কলকাতা ছেড়ে রওনা দিয়েছি পূর্ববঙ্গের উদ্দেশে। মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা জারি হয়েছে, সরকারি চাকুরেরা কে কোন রাষ্ট্রে থাকবেন বা যাবেন জানিয়ে দিয়েছেন। বাবা তো অবশ্যই পাকিস্তানে আসবেন। প্রশ্নই ওঠে না, না-আসার: আমরা তো ঢাকা জেলারই লোক, খাস বিক্রমপুরের। রওনা দিলেন আগস্ট মাস শুরু হতে না-হতেই। ট্রাকে আমাদের জিনিসপত্র, আমরা একটা ট্যাক্সিতে, গন্তব্য শেয়ালদা, যে স্টেশনে একদিন এসে নেমেছিলাম, মাত্র ন' মাস আগে।

শেয়ালদা থেকে চলেছি গোয়ালন্দে। পদ্মার অভিমুখে। পৌঁছে দেখি এ আরেক পদ্মা, বিশাল, প্রায় সমুদ্র। স্টিমারে করে সেই যাত্রা ভুলবার নয়। অনেক অনেক বছর পরে উচ্চশিক্ষার জন্য এক অভিযান শেষে লিভারপুল থেকে জাহাজে চেপে বম্বেতে এসে নেমেছিলাম: এই ভ্রমণও উপভোগ করেছি: কিন্তু গোয়ালন্দ থেকে ভাগ্যকুল যাবার আমার কৈশোরিক অভিজ্ঞতা এখনো তুলনাবিহীন। চলেছি নতুন দেশে, স্বপ্নের পাকিস্তানে। আত্মীয়স্বজন অনেকে চলেছেন সঙ্গে। স্টিমার ভর্তি এক নতুন সৌহার্দ্য, নবীন সামাজিকতা। আর সেই স্টিমারের রান্না করা খাবার, এখনো মনে হয় স্বাদ লেগে আছে মুখে।

পদ্মাপারে আমাদের নানাবাড়ি। উঠেছিলাম সেখানে। চারদিকে জলাভূমি, খালবিল, আর পদ্মা নদী। সেই পদ্মা-ইলিশের, নৌকার, পাখিদের, খোলা বাতাসের। ১৪ আগস্ট আশপাশের যত মধ্যবিত্ত এসে ভিড় করেছে স্টিমারঘাটে। স্বাধীনতা আসবে। স্বাধীনতা মানে গোয়ালন্দ থেকে একটি স্টিমার, যার মাথার ওপরে পতপত করে উড়ছে পাকিস্তানের সবুজ নিশান। মাত্র কয়েক মাস আগে ট্রামের মাথায় যে তিন ধরনের তিনটি পতাকা দেখেছিলাম তাদের দুটি এখন নিশ্চিহ্ন, একটিই সর্বেসর্বা। স্টিমারটিকে ছোট ছোট পতাকা এবং রঙিন কাগজের শিকলি দিয়ে সাজানো হয়েছে। ঘাটের কাছে আসবে কি, তার আগেই ঘাট থেকে গগনবিদারী নিনাদ উঠেছে, 'নারায়ে তকবির আল্লা হো আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ কায়েদে আজম জিন্দাবাদ'। স্টিমারের যাত্রী ও কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছেন সে-উৎসবে। স্বাধীনতা এসে গেছে। সন্দেহ কী।

কলকাতা চলে গেল, আমরা এখন ঢাকাকে গড়ে তুলব। এসব কথা শুনেছি। আমাদের অবশ্য প্রথমে ঢাকা যাওয়া হয়নি, গেছিলাম ময়মনসিংহে। সেখানে বাবার অফিস বসেছিল, অস্থায়ীভাবে। ময়মনসিংহে বাসা পাওয়া খুব কষ্ট ছিল। রেললাইনের পাশে টিনের বাড়ি পাওয়া গেল একটা। কিন্তু আমরা দমে যাইনি। আমাদের চোখে স্বপ্ন ভাসছে। নদীও পেলাম। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, কিন্তু বড়ই শীর্ণ দশা তার তখন।

ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় এসেছি সাতচল্লিশের ডিসেম্বরে। ফুলবাড়িয়া স্টেশন দেখে দমে না-যাবার কোনো কারণই ছিল না। ছিল ঘোড়ার গাড়ি, রাস্তায় কেরোসিনের টিমটিমে বাতি, ঘরের ভেতরেও তাই। কোথায় বিদ্যুৎ, কোথায় প্রবহমান পানি।

সদরঘাট ছিল। সদরঘাটের ধারেই আমাদের স্কুল ও কলেজ। কিন্তু থাকি তো আমরা প্রথমে নাজিরাবাজারে, পরে বেগমবাজারে। সেখানে তো সড়কও নেই, কেবল গলি আর গলি। বায়ান্ন বাজার তেপান্ন গলি বড়ই মূর্তমান চতুর্দিকে। দোলাই খাল ছিল, নৌকা আসত। গেন্ডারিয়ার পুলের ওপর দাঁড়িয়ে নৌকার যাতায়াত চোখে পড়ত। আমাদের চোখের সামনেই সে-খাল ভরাট হয়ে গেল। ম্রিয়মাণ হতে থাকল বুড়িগঙ্গা। যেন বুড়িয়ে গেছে, মারা যাবে। মৃত্যুর প্রতীক্ষাতে কাল গুনছে। তবু ছিল। আমরা লঞ্চে করে গ্রামে যেতাম। খুবই ধীর তার গতি, বাতাসকেও হার মানায়। পাঁচ ঘণ্টা লাগত দশ মাইলের পথ পার হতে। এমনকি গয়নার নৌকা নামক ভয়াবহ এক বাহনেও এক রাতে নদী পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে আমার, বয়স্ক এক আত্মীয়ের সঙ্গে। বর্ষায় থইথই করে পানি। বাড়িগুলোকে মনে হয় দ্বীপ। একবার বন্যা নয় প্লাবনই দেখা দিয়েছিল সমস্ত এলাকায়। ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত পানি। কিন্তু ভারি উপভোগের বিষয় ছিল আমাদের জন্য সমস্ত ব্যাপারটা। নৌকাতে করে নানা জায়গায় যাচ্ছি, আত্মীয়দের গ্রামেযাওয়া হচ্ছে। মাছ ধরছি। ভয় ছিল না, কেননা ঘটনাক্রমে আমি সাঁতার জানতাম।

স্কুলে ভর্তি হয়ে শুনি শিক্ষকদের অনেকেই চলে গেছেন। খুব খ্যাতি ছিল তাদের। আমার বাবা নামকরা স্কুল খুঁজতেন, সেন্ট গ্রেগরি স্কুলকেই নিশানা ঠিক করেছিলেন। সেখানেই নিয়ে গেলেন আমাদের দু'ভাইকে। ছোটখাটো একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল হয়তো, তাতে দু'ভাই টিকে গেছি। শিক্ষকেরা যারা তখনো ছিলেন তারাও অত্যন্ত দক্ষ। রায় স্যার ছিলেন, বাংলা পড়াতেন। তার রচিত বাংলা পাঠ্যবই তখন বেশ পরিচিত। চৌধুরী স্যার পড়াতেন অঙ্ক। চক্রবর্তী স্যারের কাছে বুদ্ধদেব বসুর গল্প শুনতাম, তার লেখা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ থেকে পড়ে শোনাতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের সহপাঠী ছিলেন। হিন্দু ছাত্ররাও অনেকে চলে গেছে ততদিনে। মুখে মুখে দাশগুপ্ত স্যারের নাম ঘুরত, তিনি ইংরেজি পড়াতেন: আমরা তাকে পাইনি। তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন ছেলেদের উদ্দেশে, সেটা পড়ে শোনানো হয়েছিল।

ভরা নদী পেলাম না। শুকিয়ে গেছে যেন স্কুল। বুড়িগঙ্গার মতোই কমছে তার তেজ। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছি পঞ্চাশে। সে-বছর আমরা ম্যাট্রিক দেব। পরীক্ষার মাস দুয়েক আগে দাঙ্গা বেধে গেছে শহরে। দাঙ্গা বলা যাবে না। কেননা দ্বিতীয় পক্ষ ছিল না, আগে যেমন থাকত। পক্ষ এবার একটাই। বিহারি মুসলমান মূলত। তারাই দাঙ্গা শুরু করল এবং হিন্দুদের দোকানপাট, ঘরবাড়ি দখল করতে থাকল। পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে দেখি, সতীর্থদের অনেকেই নেই। তারা চলে গেছে। সুবিমল, সুধাংশু, অরুণ, সীতাংশু, শিবরঞ্জন-এরা কেউই পরীক্ষা দিতে আসেনি। কেবল প্রশান্ত এসেছে। খুব মলিন ও বিপন্ন তার চেহারা। নবাবপুর রোডে ওদের মস্ত বড় ওষুধের দোকান ছিল। লুট হয়ে গেছে। প্রশান্তকে নিয়ে ওর বাবা তখনো রয়েছেন ঢাকায়, অন্যদের পাঠিয়ে দিয়েছেন কলকাতায়। প্রশান্তও চলে যাবে বাবার হাত ধরে, পরীক্ষার পরে।

বাল্য ও কৈশোরের এই কালটাকে আমি দেখি নদী হারানোর সময় হিসেবে। নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, কোথাও কোথাও রেখায় পরিণত হচ্ছে। কেবল নদী নয় তো, জলাশয়ও দেখলাম যাচ্ছে শুকিয়ে। সামাজিক বিল ঝিল এমনকি নদীও ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে যাচ্ছে চলে। এসব ঘটনার গতি দুর্মর, ভয়ঙ্কর, দ্বিধাহীন। তার জায়গায় সড়ক পাওয়া যাচ্ছে। গাড়ি এসেছে। তৈরি হয়েছে যানজট। বিঘ্নিত হচ্ছে চলাচল। বাড়ছে ধোঁয়া।

কিন্তু তারচেয়েও সর্বনাশের ঘটনা হচ্ছে এই যে মানুষের ভেতরে যে সহানুভূতি, ভালোবাসা, সহমর্মিতা ছিল, যাদেরকে নদীর মতোই বহমান মনে হতো, সে-সবও যাচ্ছে শুকিয়ে। মানুষ ব্যস্ত, বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিগত। তার জীবনে সামাজিকতা হ্রাস ঘটছে, ক্রমাগত। আমরা শুকনো মানুষে পরিণত হয়েছি। আমাদের পুরাতন গ্রামকে আর চিনতে পারি না। চিনব কী করে, সে তো আসলে নেই। গেছে হারিয়ে। উন্নতির অন্তরালে। সেখান থেকে বাসে চেপে ঢাকায় আসা যায়। লোকে বলে অবিশ্বাস্য। তা অবিশ্বাস্য বটে। কিন্তু পানি কোথায়? খাল? নদী? নেই, তারা নেই। তারা নিশ্চিহ্ন, অবলুপ্ত।

পেয়েছি নিশ্চয়ই অনেক কিছু, কিন্তু হারিয়েছি যা তা সামান্য নয়। উন্নতি মাপবার অনেক মাপকাঠি আছে। গড়পড়তা আয়, প্রবৃদ্ধির হার, দালান, কোঠা, পরিসংখ্যান: কিন্তু ভেতরে কেমন আছি সেটা জানব কী করে। আমার জন্য জানবার উপায় আছে। নদীর দিকে তাকানো। বাল্যে ও কৈশোরে নদী ছিল, এখন তারা নেই। সড়ক কি কখনো বিকল্প হতে পারে নদীর, হওয়া সম্ভব কখনো?